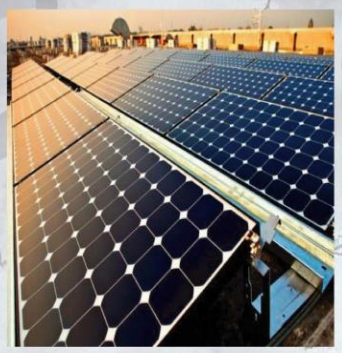

"সোলার নেট মিটার ব্যবহারে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে সবার ঘরে"

স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার ব্যবহার করি, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে সাহায্য করি

- স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার ব্যবহার করলে ঘরে বসেই বিদ্যুতের ব্যবহার জানা যাবে ।
- ঘরে বসেই স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটারে মোবাইল এ্যাপস্ এর মাধ্যমে রিচার্জ করে বিদ্যুৎ সংযোগ সচল রাখুন।
- আপনার পরিবারের বাজেট অনুযায়ী পূর্ব থেকেই মিটারে বিদ্যুৎ ব্যবহার নির্দিষ্ট করা যাবে। ফলে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে আপনাকে সাহায্য করবে।
- স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার শর্ট সার্কিট জনিত দূর্ঘটনা রোধ করে গ্রাহকের বিদ্যুৎ ব্যবহার নিরাপদ রাখে।
- মিটার রিডিং ভুল ভ্রান্ড়ি জনিত বিল হতে রক্ষা পেতে আজই স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার ব্যবহার করুন।
- স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ বিলের বিলম্ব মাশুল থাকবে না।
- মিটার প্রতিস্থাপনের সময় প্রতি গ্রাহককে অপারেটিং ম্যানুয়াল প্রদান করা হয়। ফলে গ্রাহকগণ সহজেই বিদ্যুৎ ব্যবহারের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারেন।
- মিটারে ব্যালান্স শেষ হয়ে গেলে তাৎক্ষনিকভাবে মিটার হতে অগ্রীম ব্যালান্স নেয়ার ব্যবস্থা আছে, ফলে বিদ্যুৎ বন্ধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।
- সাপ্তাহিক ছুটি, সরকারি ছুটির দিনে এবং অফিস সময়ের পরে (বিকাল ৪:০০ টা থেকে পরদিন সকাল ১০:০০ টা পর্যন্ড়) মিটারে ব্যালান্স না থাকলেও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবে না।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখতে স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার ব্যবহার নিশ্চিত করুন

ওজোপাডিকো সদা গ্রাহক সেবায় নিয়োজিত

WEST ZONE POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED
(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)
Bidyut Bhaban, Boyra Main Road, Khulna-9000, Bangladesh
Tel : + 880-41-811573, 811574, 811575, Fax : +880-41-731786
E-mail : md@wzpdcl.org.bd, wzpdcl.md@gmail.com

পদ্মার এপারের বিদ্যুৎ

বিজয় উল্লাস ২০১৮

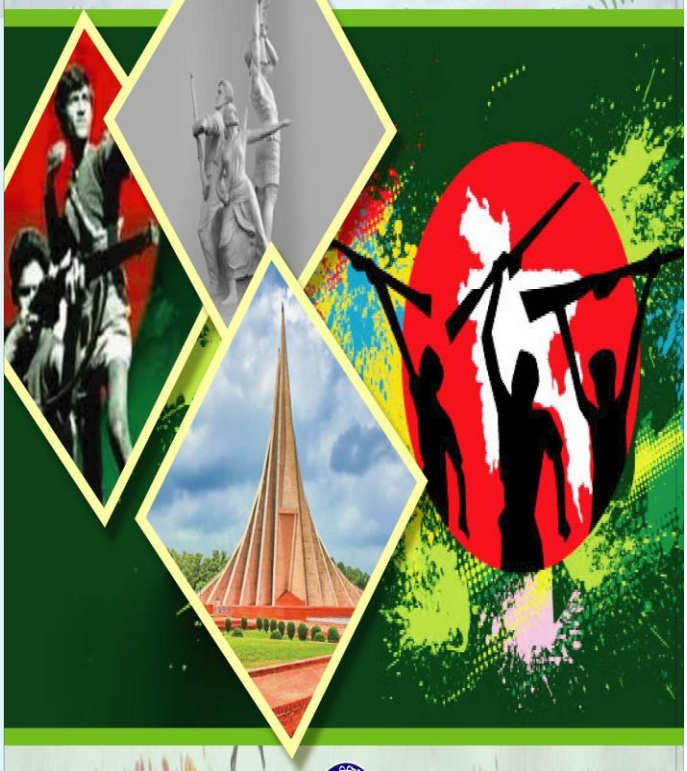

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো)

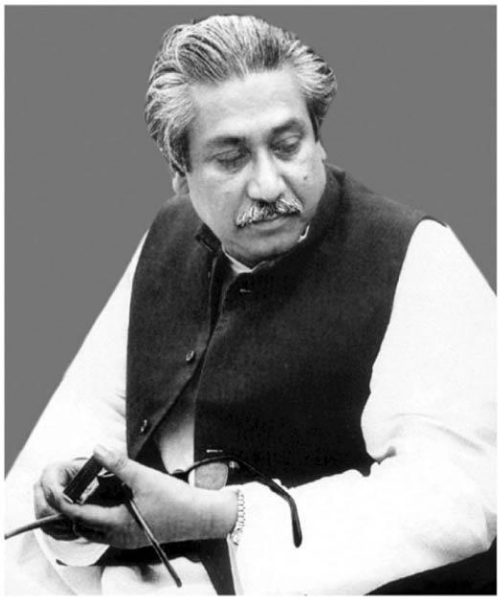

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ বীরশ্রেষ্ঠগণ

মতিউর রহমান

মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

মোহাম্মদ রুহুল আমিন

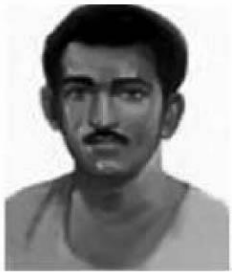

মোহাম্মদ হামিদুর রহমান

মুন্সি আব্দুর রউফ

নূর মোহাম্মদ শেখ

মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল

স্মরণিকা কমিটি

জনাব মোঃ সাবির উদ্দিন
প্রধান প্রকৌশলী (ইএসসি এন্ড এস)
আহবায়ক, স্মরণিকা কমিটি

জনাব মোঃ সাইফুজ্জামান
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পিএন্ডডি
সদস্য সচিব, স্মরণিকা কমিটি

জনাব এ এন এম মোস্তাফিজুর রহমান
উপ-মহাব্যবস্থাপক (হিসাব)
সদস্য, স্মরণিকা কমিটি

জনাব আব্দুল্লাহ ফারুক
উপ-মহাব্যবস্থাপক (অডিট)
সদস্য, স্মরণিকা কমিটি

জনাব মোঃ রুহুল আমিন
ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী প্রকৌশলী
সদস্য, স্মরণিকা কমিটি

জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম
সহকারী প্রকৌশলী, আইসিটি শাখা
সদস্য, স্মরণিকা কমিটি

জনাব মোঃ মতিউর রহমান
সহকারী প্রকৌশলী, সিস্টেম কন্ট্রোল এন্ড প্রটেকশন
সদস্য, স্মরণিকা কমিটি

বাণী

মহান বিজয় দিবস-২০১৮ উপলক্ষে আমি ওজোপাডিকো'র কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সকল দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এর উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস-২০১৮ উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আজকের এ দিনে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে এই দিনে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের মধ্যদিয়ে স্বাধীনতা পরিপূর্ণতা পায়। আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহীদকে, স্মরণ করছি দুই লক্ষের অধিক সম্ভ্রমহারা মা-বোনকে, যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন স্বদেশভূমি পেয়েছি। সেই সাথে এসেছে আমাদের মহান বিজয় দিবস-১৬ই ডিসেম্বর। বহু ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে আরও অর্থবহ করতে ও গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে দলমত নির্বিশেষে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

আগামী দিনের বাংলাদেশ হোক জাতির পিতার কাঙ্খিত সোনার বাংলা যেখানে সকলের জন্য সম্ভাবনার দুয়ার থাকবে অবারিত।

(প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিন)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ওজোপাডিকো, খুলনা।

সম্পাদকীয়

১৬ ডিসেম্বর জাতীয় মহান বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ভাষনের মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতীর মুক্তির ঘোষণা ফুটে উঠে।

এরই ধারাবাহিকতায় প্রায় দুইশত বছরের উপনিবেশিক শাসনের বেড়াজাল ভেঙ্গে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

৪৮তম মহান বিজয় দিবস যথাযথ মর্যাদায় পালনের লক্ষে গৃহীত কর্মসূচির আওতায় একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ওজোপাডিকো কর্তৃপক্ষ। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে "বিজয় উল্লাস-২০১৮" স্মরণিকায় যাঁরা লেখা দিয়েছেন, তাঁরা কেউই পেশাদার লেখক নন এবং অতি সংক্ষিপ্ত সময়ে এ স্মরণিকাটি প্রকাশ করতে গিয়ে ভুল-ত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক। তাই সকলকে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার আহ্বান জানাচ্ছি।

আগামী দিনে বর্ধিত কলেবরে আরও পরিশীলিত আকারে আপনাদের সহযোগিতায় স্মরণিকা প্রকাশের ইচ্ছা রইল। স্মরণিকা সম্পাদনা কমিটিসহ এ প্রকাশনায় লেখা দিয়ে, বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং বিভিন্নভাবে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন-তাঁদের সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

(প্রকৌশলী মোঃ সাবির উদ্দিন)
সম্পাদক স্মরণিকা প্রকাশনা কমিটি
ও
প্রধান প্রকৌশলী (ইএসসিএন্ডএস),
ওজোপাডিকো

সূচীপত্র

স্বাধীনতা তুমি	০৬
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা	০৭
বাংলার গান গাই	০৮
স্মৃতিতে আমার বাবা ও মুক্তিযুদ্ধ	০৯-১১
বিজয়ীর বেশে	১২
আমাদের বিজয় দিবস	১৩
১৬-ই ডিসেম্বর	১৪
বীর প্রতীক কিশোর মোজাম্মেলের অ্যাডভেঞ্চার	১৫-১৬
বিদ্যুৎ কল্যাণে	১৭
প্রতিজ্ঞা	১৮
বিজয়	১৮
বাস্তবতা	১৯
আধুনিকতা	২০
জন্ডিস একটি মারাত্মক ব্যাধি	২১-২৪

উদ্ভাবনের নতুন দেশ আলোকিত বাংলাদেশ

স্বাধীনতা তুমি

কে এম আনোয়ারুল ইসলাম*
বীর মুক্তিযোদ্ধা ও লেখক

স্বাধীনতা তুমি, মুক্ত আকাশে
সাদা মেঘের ভেলা,
স্বাধীনতা তুমি গাঁয়ের পথে
কিশোরীর পথ চলা।
স্বাধীনতা তুমি, মায়ের শাড়ির
স্নেহ জড়ানো আঁচল,
স্বাধীনতা তুমি, শহীদ রক্তের
ফিনকি দেয়া দোল।

স্বাধীনতা তুমি, মুক্তিযোদ্ধার
উদ্যত স্টেইন গান,
স্বাধীনতা তুমি ভাষা শহীদের
শাশ্বত স্মৃতি অম্লান।
স্বাধীনতা তুমি, চিত্র শিল্পীর
রং মাখানো তুলি,
স্বাধীনতা তুমি, সদ্য-জাত
শিশুর মুখের বুলি।

স্বাধীনতা তুমি, গীতিকারের
হৃদয় নিংড়ানো কথা,
স্বাধীনতা তুমি, সন্তান হারানো
দুখিনী মায়ের ব্যথা।
স্বাধীনতা তুমি, কণ্ঠ শিল্পীর
মন ভোলানো সুর,
স্বাধীনতা তুমি, সূর্য উদয়ের
নতুন একটি ভোর।

স্বাধীনতা তুমি, বন্ধুর হাতের
শিহরণ জাগানো চিঠি
স্বাধীনতা তুমি, লাখ শহীদের
জানা-অজানা দিঠি।
স্বাধীনতা তুমি, কবির লেখা
জীবন জাগানো কবিতা,
স্বাধীনতা তুমি, সংশপ্তকের
রণাঙ্গনে তোলা ছবিটা।

স্বাধীনতা তুমি, বৈশাখী ঝড়ে
বিধ্বস্ত বাড়ি ঘর,
স্বাধীনতা তুমি, একাত্তরের
সাতই মার্চের কণ্ঠস্বর।
স্বাধীনতা তুমি, রেচকোর্চ ময়দানে
লক্ষ কোটি বাঁশের লাঠি
স্বাধীনতা তুমি, লাখো শহীদের
রক্তে ভেজা মাটি।

স্বাধীনতা তুমি, রক্তাক্ত একাত্তরে
আমরণ মুক্তিযুদ্ধ
স্বাধীনতা তুমি, শানিত ব্যায়োনেটে
শত্রু নিধনে অনিরুদ্ধ।
স্বাধীনতা তুমি, আমার দেশের
ভেজা মাটির গন্ধ,
স্বাধীনতা তুমি, বহমান নদীর
ছলাত ছলাত ছন্দ।

স্বাধীনতা তুমি, ভোরের আযান
দোয়েল পাখির ডাক
স্বাধীনতা তুমি, সীমান্ত রক্ষীর
মেদিনী কাঁপানো হাঁক।

স্বাধীনতা তুমি, মায়ের স্নেহ
বোনের মধুর ভালোবাসা,

স্বাধীনতা তুমি, ফসলের ক্ষেত
চাষীর প্রাণের আশা
স্বাধীনতা তুমি, রক্ত রাঙ্গা
লাল সবুজের পতাকা,
স্বাধীনতা তুমি, শিল্পীর তুলিতে
দেশের ছবিটি আঁকা।
স্বাধীনতা তুমি, অমল ধবল
শাপলা শিউলির ঘ্রাণ,

স্বাধীনতা তুমি, শীর্ষ বাসনার
অমর একটি প্রাণ।

স্বাধীনতা তুমি, বুলেট বিদ্ধ
মুক্তিযোদ্ধার দেহ,
স্বাধীনতা তুমি, বীরঙ্গনা সখিনা
তোমায় ভুল্বোনা কেহ।
স্বাধীনতা তুমি, একটি জাতির
আসমান ঐশী সম্মান,
স্বাধীনতা তুমি, মানব জাতির
খোদার দেয়া দান।

*লেখক প্রকৌঃ মোঃ খালীদুল ইসলাম খান
নির্বাহী প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত)
বরগুনা বিদ্যুৎ সরবরাহ - এর পিতা।

**বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন,
উৎপাদনের চেয়ে সাশ্রয় অনেক
বেশী সহজতর**

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

-প্রকৌশলী মোঃ সাইফুজ্জামান*

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় এসেছে। বহু ত্যাগ, রক্ত, জীবন আর সম্ভ্রমের বিনিময়ে বাঙ্গালী জাতির এ- অর্জন। বাঙ্গালী জাতি প্রথমে ভাষার জন্য ১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছে পরবর্তীতে অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্য প্রতিবাদ করেছে- এরই ধারাবাহিকতায় এসেছে মহান মুক্তিযুদ্ধ- পরবর্তীতে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা। এই অর্জন সহজ পথে আসেনি। বিশেষ করে দেশীয় শত্রুদের বিরুদ্ধাচারন। মুক্তিযুদ্ধের দেশীয় বিরোধীতাকারীরা ছিল সবচেয়ে ভয়ানক। বিদেশী পাকিস্তানী সৈন্যদেরকে সর্বোতভাবে তারা সহায়তা করেছে। মুক্তিবাহিনী তথা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে বিভিন্নভাবে বিপদে ফেলে মুক্তিসংগ্রামের গতিকে ভূলুণ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে এবং সে চেষ্টা এখনো অব্যাহত আছে।

মুক্তিযুদ্ধের পর ৪৭ (সাতচল্লিশ) বছর পার হয়েছে। জাতি হিসাবে আমরা আন্তর্জাতিক বিশ্বে অনেক সুনাম করেছি। কিন্তু যে চেতনাকে বুকে ধারন করে ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ মানুষ বিনা শর্তে জীবন দিয়েছে- তাঁদের ত্যাগ কি স্বার্থক হয়েছে? তাঁরা কি শুধুই একটি স্বাধীন ভূমির জন্য প্রাণ দিয়েছেন? তাঁদের লক্ষ্য কি ছিল? তাঁদের লক্ষ্য ছিল সাধারন মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি। যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমরা ৪৭-র পর থেকে লড়েছি তা থেকে মুক্তি পেতে। মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে- স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছে- স্বাধীন স্বার্বভৌম দেশের স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলাদেশ। কিন্তু যে চেতনাকে ধারন করে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত দেশের সংবিধান পেলাম- তার চার মূলনীতি আজ ভুলণ্ঠিত। বার বার সে সংবিধান কাটা-ছেড়া হয়েছে শুধু সুবিধাবাদীদের স্বার্থে-সাধারন জনগণের স্বার্থ উপেক্ষিত থেকেছে। মুক্তিযুদ্ধের মূল spirit যে অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে পরিত্রান, সাম্প্রদায়িকতা থেকে পরিত্রান, সামাজিক ন্যায় বিচার, গণতন্ত্র বার বার হোঁচট খেয়েছে। কিন্তু এই মূলনীতির মাধ্যমে স্থাপিত চেতনা আজ অবক্ষয়ের পথে। দেশী-বিদেশী স্বার্থন্বেষীরা আজ শকুনের মত খাবলে নেওয়ার চেষ্টায় রত। বিভিন্নভাবে উন্নয়নের গতিপথ রুদ্ধ করার অপচেষ্টা অতীতে যেমন হয়েছে- বর্তমানেও হচ্ছে। এমন কিছু ঘটনা ঘটছে যা মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনার সাথে একেবারেই যায় না। যারা মুক্তিযুদ্ধের সরাসরি বিরোধীতাকারী গণতন্ত্রের দোহায় দিয়ে তাদের সাথে ঐক্যের হালুয়ারুটি ভাগাভাগির চেষ্টা। আসলে সকলের একটাই লক্ষ্য। গণতন্ত্র নয়, উন্নয়নতন্ত্র নয়- শুধুই ক্ষমতার অংশীদারিত্ব। কেউ ক্ষমতায় থেকে চেতনা পরিপন্থী কাজ করছে- কেউ বা ক্ষমতার বাইরে থেকে। বার বার যুদ্ধাপরাধীরা ক্ষমতার পালাবদলের সুবিধা নিয়েছে- আর তা শুধু সম্ভব হয়েছে- মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির বিভক্তির কারণে- এটা হয়েছে শুধুই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদারিত্বকে কেন্দ্র করে। কোথায় আজ অ-সাম্প্রদায়িক চেতনা বিভিন্ন সমীকরণে ধর্মীয় রাজনৈতিক চেতনার সাথে আপোষ করা হয়েছে। রাষ্ট্র ক্ষমতার অংশীদারিত্বের ব্যবহার হচ্ছে ব্যক্তিসম্পর্কের লাভ-লোকসানের জন্য। ৭১-র বীর শহীদেরা রক্ত দিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছেন- এর পর দেশী-বিদেশী চক্রান্তের কাছে দেশকে বিপথগামী করা হয়েছে ৭৫ সালে। এরপর থেকেই দেশ চলছে এদিক-ওদিক দুলে- কখনোই রেল লাইনের সোজা পথে উঠতে পারেনি। এখন চলছে নতুন চক্রান্ত।

লক্ষ্য কি? লক্ষ্য একটাই- ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ- তা সে যুদ্ধাপরাধীর সাথে আপোষ করে হলেও।

তাহলে ৭১- এ এত বড় ত্যাগ স্বীকার কেন?

কিন্তু একথা ঠিক, শহীদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না- বাংলাদেশ মাথা তুলে দাঁড়াবেই। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠিত হবেই। নতুন প্রজন্মই তা করে দেখাবে।

* তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, সদর দপ্তর, খুলনা।

বাংলার গান গাই

*প্রকৌশলী মোঃ আরিফুর রহমান(রানা সিংহ)

মা, ওরা আমাকে পংগু বলেছে
ওরা বলছে আমার পা নাই
মা, আমার কষ্ট নাই
আমি বাংলার গান গাই।

মা, ওরা আমাকে অন্ধ বলেছে
ওরা বলেছে আমার চোখ নাই
মা, আমার দু:খ নাই
আমি বাংলার গান গাই।

মা, ওরা আমাকে নুলা বলেছে
ওরা বলেছে আমার হাত নাই
মা,আমার বেদনা নাই
আমি বাংলার গান গাই।

মা, ওরা আমাকে প্রতিবন্ধী বলেছে
ওরা বলেছে আমার চলার ক্ষমতা নাই
মা, আমার জ্বালা নাই
আমি বাংলার গান গাই।

মা, আমি আলীর তলোয়ার, ওমরের হুংকার
বকরের ত্যাগ আর নবীজীর বিশ্বাস নিয়ে
নেমেছিলাম শান্তির আশায়
আমার হাত-পা-চোখ সব দিয়েছি
আমি মরেছি কিন্তু হারিনি।
মা, আমি তোমাকে ছাড়িনি,
মা, আমি তোমার সন্তান শহীদ স্মরণি ॥

মা, আমি চক্র বিষ্ণুর,ত্রিশুল শিবের
তলোয়ার কার্তিকের, আর অস্ত্র কুবের
আমার হাত-পা-চোখ দেহ সব দিয়েছি
আমি মরেছি কিন্তু হারিনি।
মা, আমি তোমাকে ছাড়িনি,
মা, আমি তোমার সন্তান বিজয় ধ্বনি ॥

* তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পওস সার্কেল, ওজোপাডিকো, কুষ্টিয়া।

স্মৃতিতে আমার বাবা ও মুক্তিযুদ্ধ

লিটন মুন্সী *

২০১৮ সালের এই বিজয়ের মাসে মনে পড়ে সেই স্বাধীনতার যুদ্ধের কথা। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মার্চ মাসের প্রথম দিকের কথা। চারিদিকে শুধু আতঙ্ক আর আতঙ্ক, কিযে হয়? প্রতিদিন রাজপথে মিছিল আর মিছিল। কেমন যেন একটা শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ। আমি তখন অনেক ছোট, এতসব বুঝিনা। বাহিরে সমবয়সী ছেলেরা বুনো ডাল-পালা নিয়ে মিছিল করছে, শ্লোগান দিচ্ছে। এই প্রথম বঙ্গবন্ধুর নাম শুনলাম। তিনি কে? কেন সবাই তাকে নিয়ে শ্লোগান দিচ্ছে বুঝি নাই। না বুঝে আমিও তাদের সঙ্গে একটা গাছের ডাল নিয়ে মিছিলে যোগ দিয়ে বঙ্গবন্ধুর নামে শ্লোগান দিলাম। সেই অনুভূতি গুলো এতই হৃদয়গ্রাহী ছিল যে, তা হৃদয়ে গেঁথে আছে।

স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় আমরা কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলায় বসবাস করতাম। আমার বাবা প্রয়াত হারুণ মুন্সী, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সাবেক মিটার পরিদর্শক, ভেড়ামারা বিদ্যুৎ সরবরাহে কর্মরত ছিলেন। আর সে কারনে আমরা স্বপরিবারে ভেড়ামারা উপজেলা সদরে ভাড়া বাসায় বসবাস করতাম। ভেড়ামারা উপজেলার অধিবাসীরা অনেক বন্ধুবৎসল। তারা সহজেই সকলকে আপন করে নিতে পারে। আমরা অপরিচিত হওয়া সত্বেও তারা আমাদের সাথে ধর্ম সম্পর্ক পাতায়। এতে নাকি তাদের সুবিধা হয়। তাই কেউবা হলো আমার দাদা-দাদী আবার কেউবা হলো চাচা-চাচি, ফুপু ইত্যাদি। তাই বিদেশ-যেয়েও আমরা আনন্দে বসবাস করতাম। মার্চ মাসে সবাই কেমন যেন আতঙ্কিত। সন্ধ্যার আগেই সবাই যার যার ঘরে ফিরত। কারন ঢাকায় কি যেন গন্ডগোল হচ্ছে। বাবা রেডিও নিয়ে বিবিসি বাংলার খবর শুনছেন। আমি এত কিছু বুঝতাম না। সারা দিন দৌড়াদৌড়ি করে সন্ধ্যা হলেই খাওয়া দাওয়া করে ভাই-বোনের সাথে ঘুমিয়ে পড়তাম। বাবা-মায়ের মধ্যে নিচু স্বরে কি যেন আলাপ হতো।

এপ্রিল মাসের ১৩ তারিখ আমরা আর আমাদের বাসায় থাকতে পারছিলাম না। চারিদিকে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। মানুষ-জন প্রাণ নিয়ে এদিক-সেদিক পালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের পাড়াটি ইতোমধ্যে খালি হয়ে গেছে। ২৫শে মার্চের গণহত্যার কথা তখন বাতাসের আগে দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। পাক আর্মি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে সাধারণ নিরস্ত্র মানুষের উপর হামলা করে মেরে ফেলছে। আর সেই সাথে তাদের ঘর-বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। আমাদের বাড়ীওয়ালা দাদা আমার বাবাকে বললেন "শুনলাম কুষ্টিয়া সদরে পাক আর্মিরা নেমেছে। তারা সামনে যাকে পাচ্ছে তাকেই গুলি করে মারছে আর ঘর-বাড়ী আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। তোমরা বাবা এখান থেকে চলে যাও। বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে।" বাবা পরদিন ভোর বেলা আমাদের নিয়ে অজানার উদ্দেশে রওয়ানা দেন। আমার মা ছিলেন অসুস্থ। কারন ১৩ দিন আগে আমার বড় বোনটি জন্ম নিয়েছে। অসুস্থ মাকে নিয়ে আমরা পালিয়ে দক্ষিণ ধারদিয়া নামক গ্রামের একজনের বাড়ীতে উঠেছিলাম। কয়েক দিন পর লোকমুখে জানলাম আমাদের পাড়ার সব বাড়ী পাক আর্মিরা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। সেদিন এই সংবাদ শুনে আমার মা খুব কেঁদেছিলেন। বাবাকে দেখলাম মাকে সান্তনা দিতে।

পাক আর্মিরা ভেড়ামারা উপজেলা সদরে দ্রুত তাদের ঘাঁটি গাড়লো। কারন ভেড়ামারা থেকে প্রাগপুর বর্ডার খুবই কাছে ছিল। তাই পাক আর্মিরা তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য বাঙ্কার খুঁড়তে আরাম্ভ করলো। আর বাঙ্কারে আলোর জন্য তাদের বিদ্যুতের প্রয়োজন ছিল। সাধারন জনগণের মত ভেড়ামারা বিদ্যুৎ সরবরাহে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী সদর থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য পালিয়ে গ্রামে চলে গেছেন। আমরা যে গ্রামে ছিলাম, সে গ্রামে আবাসিক প্রকৌশলী সাহেবও পরিবার নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। একদিন সকালে রাজাকাররা এসে বাবাকে ঘর থেকে

ডেকে নিয়ে যায়। বাবা বাহিরে এসে দেখে আবাসিক প্রকৌশলী সাহেবকেও তারা ধরে এনেছে। মা সহ আমরা সবাই খুব কান্না-কাটি করছিলাম। কারন তখন এমন করে লোকজনকে ওরা উঠিয়ে নিয়ে যেয়ে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ থেকে গুলি করে নিচে নদীতে ফেলে দিত। ভাগ্য ভালো থাকলে তাদের আত্মীয়-স্বজনরা তাদের লাশ পেত। আর না হলে তারা হারিয়ে যেত তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যেতনা। আমরা সে ভয়ই পাচ্ছিলাম। আর মনে হয় তাদের দেখতে পারবো না। এই মনে হয় শেষ দেখা। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল, যা আমি ওই বয়সে বুঝাতে পারছিলাম না। কেউ আমাদেরকে সান্তনা দেবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না। নিরবে চোখের পানি ফেলছিলো। আমরা ধরেই নিলাম এই বুঝি আমাদের শেষ দেখা। আমরা মনে হয় আর বাবা বলে কাউকে ডাকতে পারবো না। সবাইকে নিয়ে রাজাকাররা ভেড়ামারা সদরের পাক আর্মিদের ঘাটিতে নিয়ে আসে। সেখানে এসে বাবা দেখতে পায় রাজাকাররা ভেড়ামারা বিদ্যুৎ সরবরাহের কর্মরত প্রায় সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকেই ক্যাম্পে ধরে এনেছে। সবার চোখে-মুখে আতঙ্ক, কয়েকজনতো হাউ-মাউ কেঁদে ফেললেন। কে যে কাকে স্বান্তনা দেবেন সবাই তো মৃত্যু ভয়ে ভীত। ভেড়ামারা উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত পাক আর্মিদের ক্যাপ্টেন এসে উর্দুতে যা বললো সেইটা হচ্ছে তারা (ভেড়ামারা বিদ্যুৎ সরবরাহে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী) কেনো তাদের সরকারী দায়িত্ব পালন না করে পালিয়ে গেছে। তাদের বাঙ্কারগুলিতে বিদ্যুতের প্রয়োজন। তাই দ্রুত সংযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য আবাসিক প্রকৌশলী জনাব তৌহিদ (পুরা নাম মনে নাই) সাহেবকে নির্দেশ দেন। আমার বাবা ভাল উর্দু বলতে পারতেন। আর তাই বাবা দো-ভাষী হিসাবে কাজ করতে শুরু করলেন। বাবা তাদের বুঝালেন যে, মুক্তি যোদ্ধাদের ভয়ে সবাই লুকিয়ে ছিল। ক্যাপ্টেন আশ্বস্থ করলো আর কোনো ভয় নাই সে নিজে সকলের নিরাপত্তা দিবে। আবাসিক প্রকৌশলী সাহেব তখন সকল কর্মচারীকে বুদ্ধি দিলেন যে, যে কোনো কাজ শেষ না করে পরের দিনের জন্য কিছু রেখে দিতে হবে। এইভাবে সবসময়ে কাজের জের রেখে চলতে হবে। হয়তো কাজ শেষ হয়ে গেলে সকলকে মেরে ফেলতে পারে। সেদিন বিকালে বাবা যখন ফিরে আসে তখন খুব কেঁদেছিলাম আমরা। সে কান্না ছিল আনন্দের, প্রিয় মানুষকে ফিরে পাওয়ার আনন্দ। যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বাবাও কেঁদেছিলেন।

আর্মিদের থেকে রাজাকারদের অত্যাচার ছিল চরম। ওরাই সাধারণ যুবক ছেলেদেরকে ধরিয়ে দিত, যুবতী মেয়েদের খবর ওরাই পাক আর্মিদের কাছে বলতো। অর্থাৎ আর্মিরা এই রাজাকারের মাধ্যমে এলাকার মধ্যে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ওদের ভয়ে বাড়ীর বৌ-ঝিরাও বাইরে বের হতে পারতো না। আমার মাকে নিয়েও আমাদের ভয় ছিল। ঘরের সামনে খেলা-ধূলা করার সময়ে নজর রাখতাম রাজাকাররা আসে কিনা। এলাকার যুবক ছেলেরা দলে-দলে পালিয়ে ওপারে ভারতে চলে যেতে লাগলো। আমার সুজা কাকা (ধর্ম সম্পর্কীয়) পালিয়ে ভারতে চলে যান। কয়েকদিন পর ফিরে আসেন ভেড়ামারা থানা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হয়ে। তিনি তার সমবয়সীদের নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি গেরিলা দল তৈরী করে পাক আর্মি আর তাদের দোসর রাজাকারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলেন। তিনি বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। যোগাযোগ করে পাক আর্মিদের সম্পর্কে বিশদভাবে জেনে নিতেন। তার লোকজন মানে মুক্তি যোদ্ধারা রাতের অন্ধকারে সুজা কাকার গোপন চিঠি নিয়ে আসতো। সেই চিঠিতে কাকা আর্মিদের অবস্থানসহ সকল বিষয় জানতে চাইতো। বাবা তার জবাবে আর্মিদের সকল খবর চিঠিতে লিখে বার্তা বাহক মুক্তিযোদ্ধার মাধ্যমে সুজা কাকাকে দিতেন। আমার মনে হয় ভেড়ামারায় মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক অপারেশন বাবার দেওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে হয়েছে। বাবাকে সুজা কাকা খুব বিশ্বাস করতেন ও আপন বড় ভাইয়ের মত ভালবাসতেন, কারন বাবার দেওয়া তথ্যগুলি নির্ভুল ছিল।

ভালো উর্দু জানার কারনে আমার বাবা আর্মি ক্যাম্পে অবাধে যাওয়া আসা করতে পারতেন। তাই তাদের অনেক গোপন বিষয় বাবা দেখতে পেতেন। আর তাইতো বাবার তথ্যের উপর সুজা কাকা নির্ভরশীল ছিলেন। যুদ্ধের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে মাসের নাম মনে নাই। আমরা তখন এক হিন্দু পরিত্যক্ত বাড়ীতে বাস করছি। হিন্দু পরিবারটি যুদ্ধের ভয়ে ভারতে পালিয়ে গেছিলো। তাদের বাড়ীটি রাজাকাররা লুট করে সমস্ত মালামাল নিয়ে গেছে। ঘরগুলির দরজা-জানালা ছিলনা। বাবা বাজার থেকে দরজা-জানালা কিনে এনে লাগিয়ে দিয়ে বসবাসের যোগ্য করেছিলেন। ওই বাড়ীতে একদিন গভীর রাতে দরজায় মৃদু যেন কিসের শব্দ হলো। বাবা দরজা খুলে দেখতে চাইলেন। মা বাবাকে বাঁধা দিলেন। কারন সেই সময়ে এমন ভাবে রাজাকাররা সাধারন মানুষের ঘরে ঢুকে অত্যাচারসহ হত্যা লুটপাট করতো। বাবা তার পরও দরজাটা খুললেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা বাবাকে টপকিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের কাপড়-

চোপড়ের মধ্যে ঢুকে পরে বাবার হাতে সুজা কাকার একখানি চিঠি ধরিয়ে দিল। চিঠিতে লেখা দু-দিন পর সুজা কাকা তার দল-বল নিয়া ভেড়ামারা থানা হামলা করতে যাচ্ছেন। আমরাসহ আরো দু-তিনটি পরিবারের কারনে তা সম্ভব হচ্ছেনা। আমরা নাকি তাদের টার্গেটের মধ্যে পড়ে যাই। তাই বাবার দায়িত্ব উল্লেখিত পরিবারগুলিসহ নির্দিষ্টদিন সকাল ৯টার মধ্যে এলাকা ত্যাগ করতে হবে। ওই দিন আমাদের বের হতে একটু দেরী হয়ে যায়। গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল, আমাদের মাথার উপর দিয়ে গুলিগুলো যেতে থাকলো। আমরা বাধ্য হয়ে বুকে হেঁটে এলাকা থেকে সরে যেতে থাকি। একটা নালার মধ্যে দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম তখন ঝোঁপ-ঝাঁড়ের পাতাগুলি গুলির আঘাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে আমাদের মাথার উপর পড়ছিলো। আমরা যখন এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্য থেকে বের হয়ে একটু হাঁপ ছেড়ে দাড়াবো, এমন সময় একজন যমদূতের মত হাতে স্টেইনগানটি আমার বাবার বুকের দিকে তাক করে ধরে রেখে বাবাকে বললো " এত দিন পাক বাহিনীর দালালী করে এখন পালাচ্ছো ? আমি থাকতে সেইটা হবেনা। আমি তোদের সবাইকে গুলি করবো।" আমাদের পরিবারসহ মোট ৩টি পরিবারের আনুমানিক ২০ জন লোক তখন সেখানে উপস্থিত ছিল। আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম এমন পরিস্থিতিতে। অনেকে ভয়ে কান্না-কাটি শুরু করে দিল। বাবা তখন সাহস করে অস্ত্রধারীর সাথে কথা বললেন। তিনি তাকে বললেন" আমার ২টি শর্ত আছে, কারন মৃত্যুর পূর্বে মানুষ শেষ ইচ্ছা ব্যক্ত করার সুযোগ পেয়ে থাকে। তো ১ম শর্ত তুমি এমন ভাবে গুলি করবে কাঁদার জন্য কেউ যেন জীবিত না থাকে। আর ২য় শর্ত হচ্ছে তুমি এই খবরটা সুজার কাছে পৌছে দিও যে তুমি ৩টি পরিবারকে ম্যাশ্ট করে দিয়েছ।" অস্ত্রধারী বাবাকে প্রশ্ন করলো সুজাকে বাবা কিভাবে চেনে ? আর সুজাকে যে বাবা চিনে তার কোনো প্রমাণ আছে কিনা ? বাবা তখন সেই চিঠিটা যে চিঠির মাধ্যমে আমরা ৩টি পরিবার বাড়ী-ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছি, সেই চিঠিটি বের করে বাবা তাকে দেখালেন। অস্ত্রধারী অস্ত্রটি উঁচিয়ে ধরে বাম হাতে বাবার কাছ থেকে চিঠিটা নিল। চিঠিটা খুলে পড়লো, হঠাৎ সেই অস্ত্রধারী তার অস্ত্রটি আমার বাবার পায়ের কাছে রেখে বাবার পা দুটি দুহাতে চেপে ধরে বলতে লাগলো "বড় ভাই আমাকে মাফ করে দেন, আমি আপনাকে চিনতে পারি নাই। সুজা আমাকে আপনাদেরকে নিয়ে একটি নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে আসতে বলেছে। আর হ্যাঁ দয়া করে সুজার কাছে এসব বলবেন না। সুজা এসব জানলে আমাকে স্যুট করবে।" বাবা তাকে আশ্বস্ত করে বললেন,"না আমি সুজাকে কিছু বলবো না।" এরপর বাবা আমাদের দিকে ফিরে বললেন চল আজ আর আমাদের মরা হলো না। এরপর আমরা তার সাথে নিরাপদ স্থানে চলে গেলাম। পরে শুনেছি সেই মুক্তিযোদ্ধার নাম ছিল আফতাব।

আমার কাছে আমার বাবা ছিল বড় বন্ধু। তিনি আমার হিরো। তিনি ছিলেন সৎ আর ফূর্তিবাজ। অনেক প্রতিভা ছিল তাঁর তিনি ভাল গান করতেন, অভিনয় করতেন, ভালো গল্প বলতে পারতেন, মানুষকে হাসাতে পারতেন, সব ধরনের গাড়ী চালাতে পারতেন । আমার সেই হিরো ১৯৮৮ সালের ১০ই জানুয়ারী আমাদের মায়া ছেড়ে এই পৃথিবী থেকে চলে গেছেন। আজও ভেড়ামারার মানুষ তাকে স্মরণ করে, তাকে মনে রেখেছে। আমি গর্বিত এমন বাবার সন্তান হতে পেরে।

* উচ্চমান হিসাব সহকারী
বিক্রয় ও বিতরণ ভিাগ-১,
ওজোপাডিকো, খুলনা।

দূর্নীতি পরিহার করি
সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ি

বিজয়ীর বেশে

কামরুল হাসান ভূঁইয়া*

তারা গিয়েছিল হেসে হেসে
জীবনের সব কিছু ফেলে, সব কিছুর আশায়
দিয়েছে ১৬, তবুও কেন দুঃখিনী মা চোখ ভাসায়।
জানি লাল সবুজ উড়বে, লাল সবুজের দেশে
মাঠে প্যারেড, সম্মান, সহানুভূতি, হাঁসির বেশে।

পাপ-পাপীকে ক্ষমা করে
মাথা উঁচিয়ে দাঁড়ানোর শপথ যে জাতি মাখে
এদিন কত পরিবার খোঁজে তবে বিজয়ীকে
সে খবর কে রাখে?
মাগো, বলে কেউ একজন তার মাটির ঘর থেকে
চোখ পড়ে যায়,
আধুনিকতার বাহনে আনা পুষ্পের ঢল দেখে
পুষ্প চাইনি মা, চাইনি স্যালুট।
চাইনি নিজেকে বীর শ্রেষ্ঠ মানতে
চেয়েছিলাম জানাতে মা
কেন গিয়েছিলাম সেই মার্চের বিকালে
১৬ কেই আনতে।

জানি, যতই আঘাত আসুক আমাদের বিজয় ম্লান হবার নয়
মানি, আমরা বীরের জাতি বাঙ্গালী ও বঙ্গবন্ধুর
৪৭ লাখ বছরেও বিলুপ্ত হবার নয়।

* নির্বাহী প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত)
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ,
ওজোপাডিকো, মাদারিপুর।

আমাদের বিজয় দিবস

-খন্দকার ইশরাক মাহমুদ*

বাঙালির জীবনে বিজয় দিবস এক অবিস্মরণীয় দিন । আমাদের বিজয় দিবস ১৬ই ডিসেম্বর। এটি আমাদের জন্য অনেক গৌরবের দিন। আমাদের স্বাধীনতার চূড়ান্ত ফসল বিজয় দিবস। দীর্ঘ নয় মাস সংগ্রাম ও ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে এদিন আমরা সত্যিকার ভাবে মাতৃভূমিকে স্বাধীন করতে সক্ষম হই। ১৯৭১ সালে নয় মাস রক্তঝরা সংগ্রামের পর ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় সাধিত হয়েছে। কিন্তু, স্বাধীনতাটি মূলত এই নয় মাসের ফসলই নয়, এর শুরু হয়েছে অনেক আগে। ১৯৪৭ সালের আগ পর্যন্ত আমাদের দেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রায় দু'শো বছর ব্রিটিশ শাসনের পর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দেয়। এরপর বাংলাদেশ হয় পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশ। পাকিস্তান রাষ্ট্রটি ছিল দুটি আলাদা ভূখন্ডে বিভক্ত। পূর্ব বাংলা পরিচিত ছিল পূর্ব পাকিস্তান নামে। অন্যটি ছিল পশ্চিম পাকিস্তান। প্রথম থেকেই পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে। তারা পূর্ব পাকিস্তানিদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরন করত । ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাঙালিরা তাদের প্রথম স্বাধীকার প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হয়। পশ্চিম পাকিস্তানিদের অত্যাচার, দুঃশাসন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ মুখ বুজে সহ্য করেনি। ১৯৬২ এর ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬৬ এর ৬ দফা এবং ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে তারা বুঝিয়ে দেয় বাঙালি কারো হাতে বন্দী থাকতে রাজী নয়। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষনের মাধ্যমে মক্তিযুদ্ধের আহবান করা হয়। সমগ্র বাঙালী জাতি একতাবদ্ধ হয়ে স্বাধীকারের দাবিতে আন্দোলন চালাতে থাকে। সকল প্রকার আপস প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হওয়ায় তৎকালীন ক্ষমতালোভী ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর সেনাবাহিনী লেলিয়ে দেয়। সমগ্র বাঙালী জাতি হানাদার শক্তির বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই যুদ্ধ ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চলে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পিলখানায় মানুষ মেরেছিল। রাজারবাগ পুলিশ লাইনে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল । ৩০ লক্ষ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছিল তারা। তাই তাদের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষ যুদ্ধ করে । আমরা ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর দেশকে স্বাধীন করি এবং বিজয় অর্জন করি । তাই এ সম্পর্কে মক্তিযুদ্ধে শহিদদের স্মরণে গাওয়া হয়-

"এক নদী রক্ত পেরিয়ে
বাংলার আকাশে রক্ষিম সূর্য় আসলে যারা
তোমাদের এই ঋণ
কোনো দিন শোধ হবে না।"

দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পরে অবশেষে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিকাল ৪টা ৩১ মিনিটে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পক্ষে লে. জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন। এ অনুষ্ঠান বা দৃশ্য দেখার জন্য সেদিন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জনতার ঢল নেমেছিল। জনতার মধ্যে সেদিন বিজয়ের আনন্দের আতিশায্যে আবেগভরা হৃদয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। রাজধানী ঢাকাসহ সমগ্র বাংলাদেশ সেদিন খুশিতে মেতে ওঠে। এ দিন বাংলাদেশের আকাশে বিজয়ের লাল সূর্য উদিত হয়। প্রতি বছর যথাযোগ্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সাথে বিজয় দিবস পালিত হচ্ছে। এদিন সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত থাকে। এদিন সরকারী ছুটির দিন। বাংলাদেশ সাজ সাজ রব ও আনন্দ নিয়ে দিনটি উদ্‌যাপন করে। বহু রক্তের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি আমাদের বিজয়। এ বিজয় বাঙালি জাতির অবিস্মরণীয় গৌরবের ধন। বিজয় ছাড়া এ জাতি গৌরবের আসনে উপনীত হতে পারত না। তাই এই দিনে আমরা সকলে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানাব এবং মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাব। সর্বোপরি বিজয়ের চেতনা জাতির সকল কর্মকান্ডে প্রবাহিত করব।

* মোসাঃ শাহিন আকতার পারভিন
নির্বাহী প্রকৌশলী
ওজোপাডিকো ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, খুলনা।

১৬-ই ডিসেম্বর

শেখ হাবিবুর রহমান*

বিজয়ের সুর - লাগে কি মধুর, সবার প্রাণে
মাঠ ঘাট নদী - যোদ্ধারা যদি, বিজয়টা আনে।
সেই বীর বেশে - যোদ্ধারা এসে, খুজে খুজে মরে,
হৃদয়ের ক্লান্তি - এনেছে যে শান্তি, সকলের দ্বারে।

এ ঘর সে ঘর - খোজে বার বার, কে-বা কাকে চেনে
কোথা আছে বোন -আমার আপন বিজয়ের দিনে।
কোথা গেছে বাবা - হায়নার থাবা, লেগেছে কি গায়?
ছোট ভাই হারা - সেও গেছে মারা, মা-কে নাহি পায়।

হে মুক্তি সেনা - লাগবেনা জানা, এসো মোর বুকে,
যুদ্ধের ময়দানে - ছিলে তুমি আনমনে, কাঁদবেনা দুখে।
ত্রিশ লক্ষ - ভেঙেছে বক্ষ, এ বিজয় আনতে,
না দিয়ে বিরতি - এত বড় ক্ষতি, পারবে কি মানতে?

মানতে যে হবে - স্বাধীনতা তবে, এমনি তে নয়,
তাজা তাজা রক্ত - হয়ে উন্মুক্ত, তবু এনেছি বিজয়।
হয়ে গুলিবিদ্ধ -তবু স্বতঃসিদ্ধ, ১৬-ই ডিসেম্বরে,
তাইতো বিজয় - নয় পরাজয়, করছি আড়ম্বরে।

স্মরণীয় ষোল - ব্যথা গুলি ভোলো, মনে নাহি ক্লেশ,
আনন্দ উল্লাস - হৃদয়ে উচ্ছাস, সোনার বাংলাদেশ।

*জুনিয়র সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব)
আহিদ,ওজোপাডিকো, যশোর।

**বিদ্যুতের অপচয় রোধ করি
আলোকিত বাংলাদেশ গড়ি**

বীর প্রতীক কিশোর মোজাম্মেলের অ্যাডভেঞ্চার

-তাসফিয়া জামান ধরিত্রী *

১৯৭১ সালের মে মাসে ভারতের ত্রিপুরার পাহাড়ি এলাকার মেলা ঘরে সেক্টর-২ এর অধীনে "ফ্রিডম ফাইটার ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট" গ্রুপের ১৩ জনের একটি দলকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিলো। তার মধ্যে চারজন ছিলো নবম শ্রেণীর ছাত্র। ঐ চারজনের মধ্যে একজন কিশোর মোজাম্মেল।

একদিন, ঐ ১৩ জনের দলের বর্ডার ক্রস করে দেশে ঢোকার কথা ছিল। কথা ছিল, গেরিলা অপারেশন করার। কিন্তু, কুমিল্লা বর্ডার ক্রস করতে গিয়ে তারা পাকবাহিনীর একটা অ্যামবুশে পড়ে যায়। বাধ্য হয়ে ফিরে আসতে হয় ত্রিপুরার ক্যাম্পে। এতে ২ নং সেক্টরের সেকেন্ড-ইন কমান্ড ক্যাপ্টেন হায়দার বিরক্ত হন। তিনি বলেন, ছোটদের দলটি এখন থেকে ক্যাম্পেই থাকবে। ক্যাম্পে- ক্যাম্পে গোলা-বারুদ আনা নেওয়া করবে। কিশোর মোজাম্মেলের মন খারাপ হয়ে যায়। তার ইচ্ছে, সে যুদ্ধ করবে, কিন্তু এটা কী হলো!

তখন সে একটা বুদ্ধি করল। সে ভাবল, যে করেই হোক হায়দার স্যারের মন জয় করতে হবে।

কিশোর মোজাম্মেল ক্যাপ্টেন হায়দারের অফিসের পাশে টানা ২২/২৩ দিন বসে রইল। তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই হবে।

একদিন.....

ক্যাপ্টেন হায়দারঃ কি ব্যাপার মোজাম্মেল, কিছু বলবে তুমি?

কিশোর মোজাম্মেলঃ জ্বী স্যার, আমারে গেরিলা যুদ্ধে পাঠান ।

ক্যাপ্টেন হায়দারঃ তোমার সাহস কেমন? কারে মারতে পারবা বলো?

কিশোর মোজাম্মেলঃ আপনিই কন, কারে মারবো?

ক্যাপ্টেন হায়দারঃ মোনেম খানকে মারতে পারবা?

কিশোর মোজাম্মেলঃ মারতে পারলে কী দিবেন? আপনার কোমরের পিস্তলটা লাগবে!

ক্যাপ্টেন হায়দারঃ হাঃ হাঃ বোকা ছেলে! এই পিস্তল তো কিছুই না! মারতে পারলে বাঙালি জাতি তোমাকে মাথায় নিয়ে নাচবে।

পরদিন ভারতীয় স্টেনগান, এসএমজি, এক্সপ্লোসিভ পি কে এবং টি এন্ড টি, কালভার্ট ব্রিজ উড়ানোর মাইন ১৪/১৬, এন্টি ট্যাঙ্ক মাইন, মর্টার, এলএমজি, থ্রি নট থ্রি রাইফেল, ৩৬ গ্রেনেড, হ্যান্ড গ্রেনেড, ফসফরাসসহ একটি দলকে দেশে পাঠানো হলো। সাথে কিশোর মোজাম্মেল। দেশে পৌঁছে মোজাম্মেলের চিন্তা, কী করে মোনেম খানকে মারা যায়?

এসময় শাজাহান এসে খবর দিল-

"আইজকা হইব না, সাহেব অসুস্থ বইলা উপরে উইঠা গেছে। ওনার ছেলে অস্ত্র নিয়া উপরে উঠার সিঁড়ির প্রথম ঘরটাই থাকেন। আইজকা বাদ দেন।"

পরদিন, মোজাম্মেল আবার ঢুকল। ২০০ ওয়াটের একটা জ্বলন্ত বাল্ব ভেঙ্গে দিল। সবাই শব্দে ভাবল চোর ঢুকেছে। শোরগোল শুরু হওয়ায় বাড়ির পাশ দিয়ে পালিয়ে গেল মোজাম্মেল। আজও ব্যর্থ.....!

দুই দিন পর আবার গেল মোজাম্মেল। শাজাহান গরু বেঁধে ভেতর থেকে বলল- "আইজ সব ঠিক আছে। সাহেব ড্রইং রুমে বইসা দুইজনের সঙ্গে কথা বলতাছে।"

মোজাম্মেল বলল, "মোনেম খান কোনটা?"

শাজাহানঃ মাঝখানে বসা মাথায় গোলটুপি।

মোজাম্মেলের চাচা মোনেম খানের বাড়িতে সিন্ধি গরুর দুধ দোয়াতেন। তার সূত্র ধরেই ঐ বাড়িতে যাতায়াত ধরল মোজাম্মেল।

একদিন, মোজাম্মেলঃ শাজাহান ভাই, মোনেম খান মানুষটা কেমন?

শাজাহানঃ বহুত খারাপ। আমাগো বেতন পর্যন্ত ভালোমতো দেয় না। সে এমুন লোক, দুধ দোয়ানোর সময় মোড়া লয়া বয়া থাকে। তিনবার পালাই গেছিলাম। পুলিশ দিয়া ধরাই আনছে।

মোজাম্মেল ভাবল, এদের দিয়েই কাজ হবে।

মোনেম খানের দুই চাকরের সাহায্য নিয়ে একদিন ১ টি ভারতীয় স্টেনগান, এইচজি হ্যান্ড গ্রেনেড আর একটা আগুন লাগানো ফসফরাস নিয়ে মোনেম খানের বাড়িতে ঢুকে কলা বাগানে আত্মগোপন করল কিশোর মোজাম্মেল। ওদিকে, বাড়ির গেইটে তখন কড়া নিরাপত্তা। বেলুচ পুলিশ, গেইটের বাইরে তাঁবু খাঁটিয়ে এক প্লাটুন পুলিশ। একটু দূরে মিলিটারি।

কিন্তু, কিশোর মোজাম্মেল তখন বেপরোয়া। আজ একটা কিছু করতেই হবে। স্টেনগান হাতে বাড়ির ভেতর ঢুকল সে। মোনেম খান বাইরে বের হলেন। সাথে সাথে গুলি!

শেষ হয়ে গেল বাংলার কুখ্যাত পাকিস্তানী দোসর মোনেম খান। আর ইতিহাসের পাতায় নাম উঠে গেল কিশোর মোজাম্মেল হকের। (বীর প্রতীক)

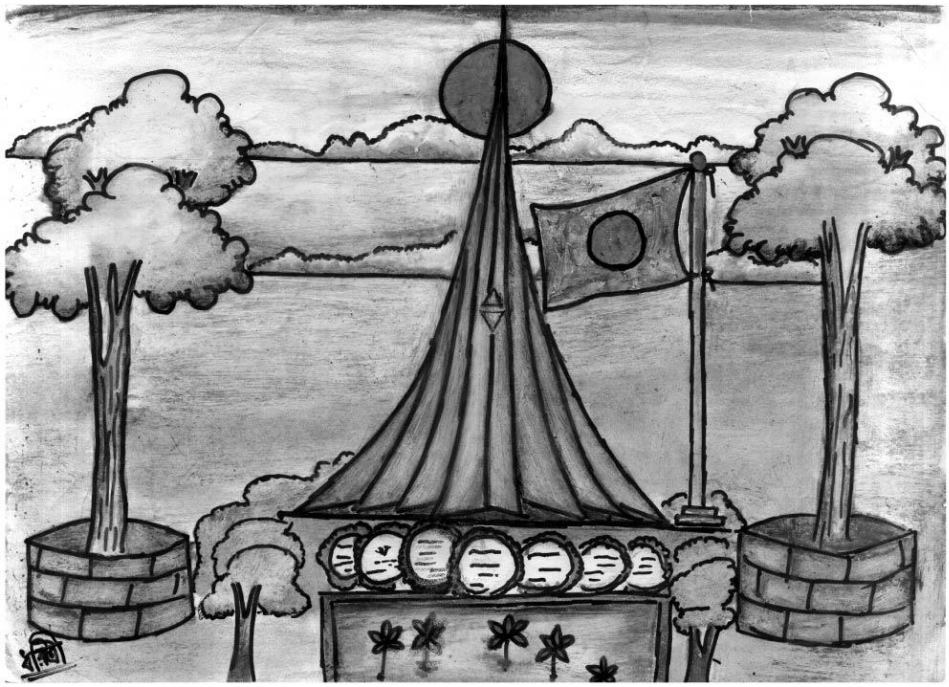

*পিতাঃ প্রকৌশলী মোঃ সাইফুজ্জামান
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, সদর দপ্তর, খুলনা।

বিদ্যুৎ কল্যাণে

মোঃ তৌহিদুর রহমান*

বিজয় শুধু নয়তো একটি দিন, বিজয় হলো ত্রিশ লক্ষের ঋণ,
বিজয়; সে-তো স্বাধীন সুবাতাস, আবার বিজয় মানে রক্তের ইতিহাস।
বঙ্গবন্ধু হত্যা ছিল স্বীকৃত খুনীর - ধীকৃত পরাজয়,
হত্যাকারীর বিচার দিয়েই এসেছে প্রকৃত জয়।
২১শে আগষ্ট গ্রেনেড ছুঁড়ে রক্ত ঝরালো যারা
ফাঁসির মঞ্চ তৈরীই আছে, পালাবে কোথায় তাঁরা ?
খুনে-লুটেরা-বিকারগ্রস্থরা, কোথায় তাঁদের খুঁটি ?
মুক্তি পাগল মানুষ এবার ধরবে চেপে টুঁটি।
বিজয় মানে স্বপ্নে গড়া "সাকো"
নতুন করে আনবে বিজয় - ওজোপাডিকো
একুশ সালের স্বপ্ন বুকে মুক্তির স্বাদ আনে,
জ্বলবে আলো সকল ঘরে - বিদ্যুৎ কল্যাণে।।

* লাইনম্যান-এ
বিক্রয় ও বিতরন বিভাগ-৩
ওজোপাডিকো, খুলনা।

আমরা বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ব্যবহার করব
ভবিষ্যতের জীবনটাকে এখন থেকেই গড়ব

প্রতিজ্ঞা

মোছাঃ শিরিনা আক্তার লিজা*

এখানে উঠেছে সূর্য্য আজ
ভয় করিনা কঠিন কাজ।
শক্ত হাতে ধরব হাল
শেষ করব শোষণের কাল।

জীবন যুদ্ধে হব জয়
কষ্ট পেতে নাহি ভয়।
আসুক যতই বাঁধার প্রাচীর
শক্ত করিব মোদের দিল।

সবার আগে আমরা যাব
বাংলার সাফল্য ফিরিয়ে আনব
এটায় হোক মোদের গান
আমরা রাখিব দেশের মান।

* কম্পিউটার অপারটের
আলমডাঙ্গা বিদুৎ সরবরাহ
ওজোপাডিকো, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

বিজয়

মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন*

স্বাধীন দেশের মুক্ত কেতন
উড়বে মোদের দেশে,
এই কামনাই নিয়ে মোরা
লড়েছি বীরের বেশে।

যুবক বুড়া বৃদ্ধা নারী
কেউ ছিলো না ঘরে,
লক্ষ্য শুধু আনবে বিজয়
ওদের নিপাত করে।

অন্নহীন এই শুকনা মুখে
করেছি মোরা যুদ্ধ,
চেষ্টা শত করেছে ওরা
করেছে মোদের রুদ্ধ।

লক্ষ শহীদ জীবন দিয়ে
হলো না তো অজয়,
দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে
পেলাম মোরা বিজয়।

*উপ-সহকারী প্রকৌশলী
আইসিটি, সদর দপ্তর
ওজোপাডিকো, খুলনা।

বাস্তবতা

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

-উম্মে কুলসুম কুসুম *

আমি উম্মে,

৭ই ডিসেম্বর কলেজ থেকে ফিরছিলাম, মিরপুর ১০ নাম্বার-এর ফুটওভার ব্রীজ পার করে রিকসা নেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ মনে হলো কেউ পেছন থেকে আমার ব্যাগ ধরে টানছে, পেছনে তাকিয়ে দেখি দুটো বাচ্চা। সম্ভবত ভাই-বোন। বড়টার বয়স আনুমানিক ৭ বছর আর ছোটটার বয়স হবে ৪ বছর। বড় বাচ্চাটার হাতে কিছু বাংলাদেশের পতাকা, আর কিছু হেডব্যান্ড, আর ছোট বাচ্চাটার কাঁধে স্কুল ব্যাগ।

আমি তাকাতেই বললো "আপা একটা ফ্লাগ নিন না, মাত্র ১০ টাকা, সামনে তো বিজয় দিবস, নিন না একটা ফ্লাগ। ছেলেটার কথা বলার ধরন দেখে একটু অবাক হলাম, ঢাকা শহরের অলিগলিতে এরকম আরো অনেক বাচ্চা আছে, কিন্তু এই বাচ্চাদুটোকে দেখে কেমন জানি লাগলো, একটা অদ্ভুদ মায়া জন্মাল, নিজের ভাইবোন দের কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ করে। আর আরো অদ্ভুত লাগলো ওদের মুখে বিজয় দিবস আর কাধে স্কুল ব্যাগ দেখে।

শুধালাম, বাবু তোমার নাম কি?

একজনের নাম বললো রিফাত, আর একজনের নাম বললো রিমি। কথা বলে জানতে পারলাম পাশের এক ছোট স্কুলে ছেলেটা ক্লাস টু আর মেয়েটা প্রি-প্লে তে পড়ে, বাবা নাই, মা পরের বাড়িতে কাজ করে। ওদের কথাগুলো সত্যি কিনা সিউর হওয়ার জন্য, ইংরেজিতে আর বাংলাতে কিছু প্রশ্ন করলাম, একটা বাদে সব প্রশ্নের উত্তরই সঠিক দিল। বড় বাচ্চাটা বললো তাদের স্কুলের ম্যাম তাদেরকে বিজয় দিবসের কথা বলেছে, মুক্তি যুদ্ধের কথা বলেছে , এমন কি তারা এটাও জানে যে ডিসেম্বর বাঙালীর বিজয়ের মাস, কথা গুলো বলে বাচ্চা দুটো একটা প্রাণ খোলা হাসি দিল। ওদের হাসি বুকের মধ্যে বিধলো, বিজয় দিবস নিয়ে বাচ্চা দুটোর কি আনন্দ, আহারে, তার বিন্দু মাত্র যদি আমাদের মাঝে থাকতো, মাঝে মাঝে নিজেকে বাঙালী বলতে লজ্জা হয়, কেননা আমরা সেই জাতি, যারা জানি না অপারেশন সার্চ লাইট কি? বিজয় দিবস কবে আর শহীদ দিবস কত তারিখ? এমন কি কাজের ব্যাস্ততায় নিজেই ভুলে গেছিলাম ১৬ ই ডিসেম্বর এর কথা। বললাম এই ফ্লাগ আর হেডব্যান্ড কই পাইছিস? উত্তর দিল এক বড় ভাই দিছে, একটা বিক্রি করে দিলে ২টাকা দিবে। মাত্র ২টাকার জন্য বাচ্চা দুটো রাস্তায় রাস্তায় বিজয়ের উল্লাস ছড়াচ্ছে, আর আমরা হাজার হাজার টাকা নিয়ে ঘুরেও উল্লাস্ পাচ্ছি না।

একটা লোক অনেকক্ষণ ধরে আমাদের লক্ষ্য করছিল। কাছে এসে বললো, "কি হয়েছে মামা? কোনো সমস্যা? এরা কিছু করেছে?" বলে বাচ্চা দুটোকে ধমক দিল আর চলে যেতে বললো, আমি আটকালাম। লোকটা বললো, "এদের কথায় ভুইলেন না! এরা এমনই।" বলে উনি চলে যাচ্ছিল।

বললাম যে, মামা একটা ফ্লাগ নিয়ে যান। লোকটা বললো, কেন? বললাম সামনে তো ১৬ ই ডিসেম্বর তাই। সে বললো, তাতে আমার কি? বলে চলে গেল। আরো বেশি অবাক হলাম। বাচ্চা দুটোকে নিয়ে পাশের ফুসকার দোকানে আসলাম, একসাথে ফুসকা খেলাম। তার পর ১০০ টাকা দিয়ে বললাম, ভাইকে দিতে হবে না। তোরা রেখেদিস। ওরা যাওয়ার সময় আমাকে একটা ফ্লাগ দিয়ে চলে গেলো। চোখে একরাশ খুশি দেখতে পেলাম।

আমিও বাসার উদ্দেশে রওনা দিলাম, ভাবছি আমাদের কাছে হয়তো বিজয় দিবসের কোনো মূল্য নেই, মূল্য নেই ১০ টাকার এই ফ্লাগ-এর। অথচ এই বিজয় দিবসই কারো কারো রোজগারের অংশ। কারো দুইবেলা খাবার যোগানোর মাধ্যম।

আসুন না, এই বিজয় দিবসে এগিয়ে আসি দেশের মানুষকে ভালোবাসতে, দেশকে ভালবাসতে, কত দশটাকায় তো নষ্ট করি কতো কাজে?

মাঝে মাঝে প্রয়োজনের বিপরীতে গিয়ে দশটাকা খরচ করি। এতে যেমন সাহায্যের মর্ম বাড়বে তেমনি সবার মাঝে ছড়িয়ে যাবে বিজয়ের আনন্দ।

*পিতাঃ মোঃ আব্দুর রব
লাইনম্যান-এ
শৈলকুপা বিদ্যুৎ সরবরাহ, ওজোপাডিকো।

আধুনিকতা

কামরুজ্জামান*

দেশের বিজয় পেয়েছি আমরা, হানাদারদের পরাস্ত করে,
পরিবর্তনের হাওয়া লেগে আজ, হারিয়ে যাচ্ছে ঐতিহ্য দূরে।
আধুনিকতার ভীড়ে হারিয়ে গেছে, অতীতের সব স্মৃতি কথা,
রোবট তুল্য মানুষ যেন, দেহটাই শুধু মাটিতে গাঁথা।
পাখির কাকলিতে ঘুম ভাঙ্গেনা আর, সূর্য্য উঠার আগে,
গাড়ীর তীব্র হর্ণের শব্দে, হৃদ কম্পন জাগে।
কয়লা চালিত রেলের ধোঁয়া, মিশেনা আর মেঘের সনে,
ককিলের কু....কু শব্দ নেই তাই, দাগ কাটেনা এখন কারো মনে।
ইঞ্জিন চালিত নৌকা গুলি, চলছে ধেয়ে নদীর বুকে,
মাঝি মাল্লার গানগুলি তাই, বিকট শব্দে যাচ্ছে ঢেকে।
রূপকথার সেই রাজার গল্প, শোনেনা কেউ মুগ্ধ হয়ে,
ফেসবুক আর নেটের মাঝে, ডুবে আছে সবে নেশার ঘোরে।
স্মার্ট ফোনের মৃদু স্পর্শে, অপরাধ প্রবনতা বাড়ছে দেশে,
আধুনিকতা যদি হয় অশ্লীলতা, চাইনা তথাকথিত এই আধুনিকতা।
বিজয়ের স্বাদ পেয়েছি যখন, হারাতে চাইনা কখনও আবার,
ফিরে পাবনা চলে যাওয়া সময়, স্মৃতির পটে রবে যা কিছু থাকার।

* জুনিয়র সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব)
আঞ্চলিক হিসাব দপ্তর
ওজোপাডিকো, ফরিদপুর।

জন্ডিস একটি মারাত্মক ব্যাধি

মোঃ আবুল বাশার*

জন্ডিসঃ লক্ষণ ও প্রতিকারঃ

জন্ডিস (Jaundice) আসলে কোন রোগ নয়, এটি একটি রোগের লক্ষণ মাত্র। Jaundice শব্দটি ফরাসি শব্দ Jaunisse থেকে এসেছে যার অর্থ হলুদাভ। জন্ডিস হলে রক্তে বিলরুবিনের মাত্রা বেড়ে যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি ১০০ মিলিঃ প্লাজমা বা সিরামে ০২ থেকে ০.৮ মিলিগ্রাম বিলিরুবিন থাকে। এর বেশি হলে জন্ডিস হয়েছে ধরা হয়। ত্বক, চোখের সাদা অংশ এবং অন্যন্য মিউকাস ঝিল্লি হলুদ হয়ে যায়। আমাদের রক্তের লোহিত কণিকাগুলো স্বাভাবিক নিয়মেই একটা সময় ভেঙ্গে গিয়ে বিলিরুবিন তৈরি করে যা পরবর্তী সময়ে লিভারে প্রক্রিয়াজাত হয়ে পিত্তরসের সাথে পিত্তনালীর সাহায্যে পরিপাকতন্ত্রে প্রবেশ করে। অন্ত্র থেকে বিলিরুবিন পায়খানার সাথে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। বিলিরুবিনের এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমা স্বাভাবিকভাবে না হয়ে যে কোনো অসঙ্গতি দেখা দিলে রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা বেড়ে যায় এবং জন্ডিস দেখা দেয়।

জন্ডিসের কারণঃ

রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা বেড়ে গেলে জন্ডিস দেখা দেয়। সাধারণত লিভারের রোগই জন্ডিসের প্রধান কারণ। আমরা যা কিছু খাই তা লিভারেই প্রক্রিয়াজাত হয়। লিভার বিভিন্ন কারণে রোগাক্রান্ত হতে পারে। হেপাটাইটিস এ, বি, সি, ডি এবং ই ভাইরাসগুলো লিভারে প্রদাহ সৃষ্টি করে যাকে বলা হয় ভাইরাল হেপাটাইটিস। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে জন্ডিসের প্রধান কারণ হলো এই হেপাটাইটিস ভাইরাসগুলো। উন্নত দেশগুলোতে অতিরিক্ত মধ্যপান জন্ডিসের একটি অন্যতম প্রধান কারণ। এছাড়াও অটোইমিউন লিভার ডিজিজ, বংশগত কারণসহ আরও নানান ধরনের লিভার রোগেও জন্ডিস হতে পারে। ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াতেও অনেক সময় জন্ডিস হয়। তাছাড়া থ্যালাসিমিয়া ও হিমোগ্লোবিন ই-ডিজিজের মতো যে সকল রোগে রক্ত ভেঙ্গে যায় কিংবা পিওনালীর পাথর অথবা টিউমার হলে জন্ডিস হতে পারে। আবার লিভার বা অন্য কোথাও ক্যান্সার হলেও জন্ডিস হতে পারে। জন্ডিস মানেই লিভারের রোগ এমনটি ভাবা তাই একেবারেই ঠিক নয়।

জন্ডিসের লক্ষণ ও উপসর্গসমূহঃ

জন্ডিসের প্রধান লক্ষণ হলো চোখ ও প্রসাবের রং হলুদ হয়ে যাওয়া আবার সমস্যা বেশি হলে পুরো শরীর গাঢ় হলুদবর্ণ ধারণ করতে পাবের।

- শারীরিক দূর্বলতা।
- ক্ষুধান্দা।
- জ্বর জ্বর অনুভুতি কিংবা কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসা।
- বমি বমি ভাব অথবা বমি।
- মৃদু বা তীব্র পেট ব্যথা।
- অনেক সময় পায়খানা সাদা হয়ে যাওয়া।

- চুলকানি।
- যকৃত শক্ত হয়ে যাওয়া।

কখন ডাক্তার দেখাবেন ?

ত্বক, চোখের সাদা অংশ হলুদ হয়ে গেলো জন্ডিস হয়েছে বলে মনে করতে হবে এবং দ্রুত ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিতে হবে।

কি কি পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে?

রক্ত পরীক্ষা, যকৃতের কার্যকারিতা এবং কোলেস্টরল পরীক্ষা, প্রোথোম্বিন টাইম, পেটের আল্ট্রসাউন্ড, প্রস্রাব পরীক্ষা অথবা যকৃতের বায়োপসি ইত্যাদি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পরীক্ষা করাতে হবে।

জন্ডিস হলে কি খাবেন নাঃ

বেশী বেশী পানি অথবা তরল জাতীয় খাবার খেলে প্রস্রাবের রং অনেকটা হালকা বা সাদা হয়ে আসে বলে জান্ডিসে আক্রান্ত রোগীরা প্রায়শই বেশী বেশী তরল খাবার খেয়ে থাকেন। সাধারণ মানুষের ধারণা এতে জন্ডিস সেরে যাবে কিন্তু বাস্তবতা হলো, এতে জন্ডিস এতটুকুও কমে না। বেশী বেশী পানি খেলে ঘন ঘন প্রস্রাব হয় বলে এটি কিছুটা হালকা হয়ে এলেও রক্তে বিলিরুবিনের পরিমাণ এতে কিছুমাত্রও কমে না। বরং বিশ্রাম যেখানে জান্ডিসের রোগীদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। বার বার টয়লেটে যেতে রোগীকে বাড়তি পরিশ্রম করতে হয়। একইভাবে বেশী বেশী ফলের রস খাওয়াও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কারণ এতেও এই একই কারণে রোগীর বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটে। পাশাপাশি বেশী বেশী ফলের রস খেলে পেটের মধ্যে ফার্মেন্টেশনের কারণে রোগীর পেট ফাঁপা, খাদ্যে অরুচি ইত্যাদি বেড়ে যেতে পারে। আমাদের দেশে আখের রস জন্ডিসের একটি বহুল প্রচলিত ওষুধ। অথচ রাস্তার পাশের যে দূষিত পানিতে আখ ভিজিয়ে রাখা সেই পানি মিশ্রিত আখের রস খেলে হেপাটাইটিস এ বা হেপাটাইটস ই ভাইরাস মানুষের শরীরে ছড়িয়ে পড়তে পারে। আমাদের দেশের একটি প্রচলিত বিশ্বাস হচ্ছে জন্ডিসের রোগীকে হলুদ দিয়ে রান্না করা তরকারি খাওয়ানো যাবে না কারণ এতে রোগীর জন্ডিস আরও বাড়তে পারে। রক্তে বিলিরুবিন নামক একটি হলুদ পিগমেন্টের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কারণেই জন্ডিস দেখা দেয়। এর সাথে হলুদের কোন সম্পর্ক নেই। এইভাবে জন্ডিসের রোগীকে তেল-মসলা না দিয়ে শুধুমাত্র সিদ্ধ করা খাবার খেতে দেওয়া ঠিক নয়। এ সমস্ত রোগীদের এমনিতেই খাবারে অরুচি থাকে তার উপর এ ধরণের খাবার রোগীদের উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী করে। তাই জন্ডিসের রোগীকে সব সময় এমন খাবার দেয়া উচিত যা তিনি খেতে পছন্দ করেন। তবে অবশ্যই বাইরের খাবার সব সময় পরিহার করতে হবে। বিশেষ করে একটু বেশি সাবধানে থাকতে হবে পানির ক্ষেত্রে। জন্ডিস থাক বা না থাক, কোনভাবেই না ফুটিয়ে পানি পান করা যাবে না। গর্ভবতী মহিলাদের বাহিরে থেকে আনা ফুচকা, চটপটি, বোরহানি আর সালাদের ব্যাপারে খুব সাবধান থাকতে হবে। বাইরের খাবার যদি খেতেই হয় তবে তা অবশ্যই গরম হতে হবে। এসময় মায়েরা প্রায়শই বাইরে থেকে আনা খাবার খেয়ে থাকেন যা থেকে তারা অনেক সময় হেপাটাইটিস ই ভাইরাস জনিত জন্ডিসে আক্রান্ত হতে পারেন। আর গর্ভাবস্থায় শেষ তিন মাসে যদি হেপাাইটিস ই হয়, তবে তা থেকে মা ও গর্ভের শিশুর মৃত্যুর শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশী আশংকা থাকে। জন্ডিস রোগীর সাথে প্লেট বা বাসন শেয়ার করার মাধ্যমে কারো এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। একইভাবে জন্ডিস রোগে আক্রান্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। একই ভাবে জন্ডিস রোগে আক্রান্ত মা নিশ্চিন্তে তার সন্তানকে দুধ পান করাতে পারেন। তবে মা'র হেপাটাইটিস বি ভাইরাস জনিত জন্ডিস থাকলে শিশুর জন্মের সাথে সাথেই হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের টিকা দিতে হবে এবং ইমিউনোগ্লোবুলিন ইঞ্জেকশন দিতে হবে। কারণ মায়ের দুধের মাধ্যমে না ছড়ালেও, মায়ের সহচর্যে শিশুর মধ্যে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ছড়ানোর আশঙ্কা থাকে এবং আমাদের দেশে অনেক হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের রোগী এভাবেই এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। তাই, জন্ডিসে আক্রান্ত রোগীর খাবারের ব্যাপারে বিভিন্ন রকম বাছ-বিচার আর সতর্কতা এসব রোগীদের ভাল রাখতে কিছুটা সাহায্য করলেও কিছু ভুল ধারণার কারণে বড় ধরণের সমস্যায়ও পড়তে পারেন। এ ব্যাপারে সঠিকভাবে জানতে হবে।

জন্ডিস প্রতিরোধে করণীয়ঃ

জন্ডিস থেকে বেঁচে থাকতে আমাদের কিছু করণীয় আছে।

- হেপাটাইটিস এ ও ই খাদ্য ও পানির মাধ্যমে সংক্রমিত হয়। আর হেপাটাইসি বি, হেপাটাইটিস সি এবং হেপাটাইটিস ডি দূষিত রক্ত, সিরিঞ্জ এবং আক্রান্ত ব্যক্তির সংঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের মাধ্যমে ছড়াতে পারে।
- সব সময় বিশুদ্ধ খাবার ও পানি খেতে হবে।
- হেপাটাইটিস এ এবং হেপাটাইটিস বি হওয়ার আশংকা মুক্ত থাকতে হেপাটাইটিস এ এবং হেপাটাইটিস বি এর ভ্যাকসিন গ্রহণ করুণ।
- শরীরে রক্ত নেয়ার প্রয়োজন হলে অবশ্যই প্রয়োজনীয় স্ক্রিনিং করে নিতে হবে।
- ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে।
- মদ্য পান ও নেশাদ্রব্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন।
- নিরাপদ যৌন মিলন করুণ।
- কল কারখানার নির্গত রাসায়নিক পদার্থ থেকে দূরে থাকুন।
- সেলুনে শেভ করার সময় অবশ্যই নতুন ব্লেড ব্যবহার করতে বলবেন।
- জন্ডিস অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণও হতে পারে তাই এই রোগ থেকে বাঁচতে সচেতন হতে হবে।

জন্ডিসের চিকিৎসাঃ

ভাইরাল হেপাটাইটিসের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেয়া চিকিযসার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হেপাটাইসের রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করার প্রয়োজন হতে পারে। ভাইরাল হেপাটাইটিস সাধারণত ৩ থেকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সেরে যায়। এ সময় ব্যথার ঔষধ যেমন, প্যারাসিটামল, এসপিরিন, ঘুমের ঔষধসহ অন্য কোনো অপ্রয়োজনীয় ঔষধ খাওয়া যাবে না। জন্ডিস হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো ঔষধই সেবন করা ঠিক হবে না। হেপাটাইটিস বি ও হেপাটাইটিস সি দু'টি কিছু কিছু ক্ষেত্রে জন্ডিস সেরে যাওয়ার পরও লিভারের দীর্ঘমেয়াদি প্রাদাহের সৃষ্টি করতে পারে, যা পরবর্তী সময়ে লিভার সিরোসিস ও লিভার ক্যান্সারের মতো জটিল রোগও তৈরি করতে পারে। তাই এ দু'টি ভাইরাসে আক্রান্ত হলে দীর্ঘ মেয়াদের লিভার বিশেষজ্ঞের অধীনে থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসা নিতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় লোহিত কণিকার ভাঙ্গন জনিত জন্ডিসের ক্ষেত্রে, একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে এই রোগ এমনিতেই সেরে যায়। কারণ দেহে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত বিলিরুবিন তৈরী হচ্ছে আর রক্তকণিকার গড় আয়ু ১২০ দিন। তাই অনেক ক্ষেত্রেই ১২০ দিন অর্থাৎ ৩ মাস পর লোহিত কণিকার ভাঙ্গন জনিত সমস্যা নতুন রক্ত কনিকা তৈরী হওয়ার কারণে ঠিক হয়ে যায় এবং জন্ডিস ভাব এমনিতেই দূর হয়ে যায়। রোগীকে পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে। লিভার বা যকৃতের বিশ্রামের জন্য শরবত ও আখের রস খেলে ভাল। খাবারে রুচি থাকলে তার, মাছ, তরকারী, পাউরুটি, দুধ ইত্যাদি খাওয়া যাবে।

পিত্তথলিতে পাথরের কারণে পেটে ব্যথা হলে পেটে তার্পিন তেল মালিশ করলে বা পেটে সেঁক দিলে কিছুটা আরাম পাওয়া যায়। রোগীকে তরল ও পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে। এ সমস্যায় ডাবের পানি, ফলের রস, ঘোল, ছানার পানি ইত্যাদি বেশ উপকারী। চর্বি যুক্ত খাবার ঘি, মাখন ইত্যাদি না খাওয়াই ভাল। যদি আপনা আপনি এই রোগ ভাল হয়ে যায়, তবে বুঝতে হবে যে পাথর বের হয়ে গেছে। নাহলে, অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে।

অন্য কোন কারণে জন্ডিস দেখা দিলে, অনেক ক্ষেত্রে তা জটিল আকার ধারণ করতে পারে। কি কারণে জন্ডিস হয়েছে তা সঠিকভাবে নির্ণয় করে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা নিতে হবে।

হেপাটাইটিস ভাইরাস থেকে বাঁচার উপায়ঃ

হেপাটাইটিস এ ও হেপাটাইটিস ই খাদ্য এবং পানির মাধ্যমে সংক্রমিত হতে পারে। আর হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি এবং হেপাটাইটিস ডি দূষিত রক্ত, সিরিঞ্জ এবং আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের মাধ্যমে ছড়াতে পারে। সবসময় বিশুদ্ধ খাবার ও পানি খেতে হবে। শরীরে রক্ত নেয়ার প্রয়োজন হলে অবশ্যই প্রয়োজনীয় স্ক্রিনিং করে নিতে হবে এবং সিরিঞ্জ ব্যবহারের প্রয়োজন হলে অবশ্যই ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে। হেপাটাইটিস বি ও হেপাটাইটিস এ'র টিকা আমাদের দেশে পাওয়া যায়। বিশেষ করে হেপাটাইটিস বি'র টিকা প্রত্যেকেরই অবশ্যই নেয়া উচিত। সেলুনে সেভ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে, যেন আগে ব্যবহার করা ব্লেড বা ক্ষুর পুনরায় ব্যবহার করা না হয়।

শেষ কথাঃ

যেহেতু জন্ডিস কোনো রোগ নয়, তাই এর কোনো ঔষধও নেই। সাধারণত ৭ থেকে ২৮ দিনের মধ্যে রক্তে বিলিরুবিনের পরিমাণ স্বাভাবিক হয়ে গেলে জন্ডিস এমনিতেই সেরে যায়। জন্ডিস অনেক ক্ষেত্রে বিপজ্জনক হতে পারে এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে তাই জন্ডিস সম্পর্কে জানতে হবে, সচেতন হতে হবে।

* চিকিৎসা সহকারী
ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ
বয়রা বিদ্যুৎ ভবন, খুলনা।

মেসার্স তৃপ্তি ফিলিং স্টেশন
ডিলার
MEGHNA
মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ
০১৭১৯-৬৮৮৭২১
০১৯৮৬-১১১২২২
পরিচালনায় : রকি এন্টারপ্রাইজ
ROCKY ENTERPRISE LIMITED
REL
খুলনা অফিস : ৫১/১ক, হাজী ইসমাইল ক্রস রোড, শেখপাড়া বাজার, খুলনা
প্রজেক্ট: টাউন নওয়াপাড়া, ফকিরহাট, বাগেরহাট।
নতুন আলোর প্রত্যয়ে উদ্ভাসিত বাংলাদেশ
১২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণে
ব্যবহৃত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানের বসুন্ধরা সিমেন্ট।
5700 PSI
বসুন্ধরা
সিমেন্ট
সেরা মানের ও সঠিক ওজনের লাফ্‌স গ্যাস
ব্যবহার করুন এবং নিশ্চিন্তে থাকুন।
LAUGFS GAS
শক্তির মানদন্ডে একধাপ এগিয়ে
ফাইভ রিংস্ প্লাস সিমেন্ট
FIVE RINGS CEMENT
OPC
Plus
☑ জার্মান প্রযুক্তি
☑ লবণাক্ততা প্রতিরোধে কার্যকরী সিমেন্ট
☑ দুবাই থেকে আমদানীকৃত উন্নতমানের ক্লিংকার
দুবাই বাংলাদেশ সিমেন্ট মিলস্ লিঃ
মোংলা, বাগেরহাট।
E-mail: info.dubcml@gmail.com, Web: www.ahossaingroup.com
Helpline: 01936 014014